

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল হচ্ছে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের গেটওয়ে। যেসব শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং আমরা যারা শিক্ষা নিয়ে কাজ করি, তাদের কাছে প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি বছর যদিও কয়েকটি পাবলিক পরীক্ষা হয়, তারপরও প্রতিটি পরীক্ষাই বেশকিছু নতুন বার্তা নিয়ে হাজির হয়, যা আমাদের চিন্তার যথেষ্ট খোরাক জোগায়। এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলের দিকে তাকালে আমরা বেশ কয়েকটি বিষয় দেখতে পাই— যেমন যশোর বোর্ডের চমক। যশোর বোর্ড আসলেই আমাদের চমকে দিয়েছে। গত বছর এ বোর্ড ছিল সর্বনিম্নে, এবার সবার ওপরে। যশোর বোর্ডে ২০১২ সালে পাসের হার ছিল ৬৭.৮৭ শতাংশ, ২০১৩ সালে ৬৭.৪৯ শতাংশ, ২০১৪ সালে ছিল ৬০.৫৮ শতাংশ এবং ২০১৫ সালে তা ছিল ৪৬.৪৫ শতাংশ। এ ফল গতবার গোটা এইচএসসি পরীক্ষার ফলের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। কেন এমনটি হয়েছিল? প্রতি বছর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞরা ও সংশ্লিষ্টরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ৩২ সেট প্রশ্ন করা হবে। তাদের মধ্যে থেকে লটারির মাধ্যমে একটি সেট বাছাই করে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। যশোর বোর্ড সেই উপযুক্ত কাজটিই করেছিল। কিন্তু তার ফল হয়েছিল উল্টো। অর্থাৎ পাসের হারে নেমেছিল ধস। ফলে কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্য বোর্ড নিশ্চয়ই যশোর বোর্ডের ওপর নাখোশ হয়। হওয়ারই কথা! কিন্তু আমরা কেউ চিন্তা করছি না, বা বলছি না যে— ওটিই ছিল আসল ফল ও আসল মূল্যায়ন। যশোর বোর্ড চাপে থাকার কারণে এবার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে চমক লাগিয়ে দিয়েছে। এবার তাই পাসের হার ৮৩.৪২ শতাংশ, যা সব সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের ওপরে। বোর্ডের ফল ভালো হলে ৫ থেকে ১০ শতাংশ বাড়ার নজির আছে; কিন্তু একেবারে দ্বিগুণ হওয়া তো এক ধরনের জাদু। সেই জাদুটিই যশোর বোর্ড এবার প্রদর্শন করেছে। তবে আনন্দের পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্টদের ভাবনার অবকাশ রয়েছে।

গত বছর সব বোর্ড মিলে ইংরেজিতে ফেল করেছিল ১৯ শতাংশ শিক্ষার্থী। আর যশোর বোর্ডে ৫০ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী ইংরেজিতে ফেল করেছিল। এবার যশোর বোর্ডে ইংরেজিতে পাসের হার ৮৯.৮৭ শতাংশ। এখানেও যশোর বোর্ড চমক উপহার দিয়েছে। অর্থাৎ যশোর বোর্ডের ডাবল চমক। ইংরেজিতে ঢাকা বোর্ডে এবার পাসের হার ৮৬.৪৬ শতাংশ, রাজশাহী বোর্ডে ৮৪.০৪ শতাংশ, কুমিল্লায় ৮৩.৫৪ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৮৭.৪২ শতাংশ, সিলেটে ৭৭.৯৫ শতাংশ, দিনাজপুরে ৭৮.২৬ শতাংশ, কারিগরি ৯৪.৩৫ এবং আট বোর্ডে ৮৫.৬১ শতাংশ। এখন ইংরেজিতে পাস কিংবা জিপিএ-৫ পাওয়া কোনো বিষয় নয়। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই 'টাচ' করুক আর নাই করুক, বিষয় সম্পর্কে

নিম্নগামী। এটিও ভালো দিক। কারণ মাদ্রাসা শিক্ষা এমনতেই অনেক পিছিয়ে আছে। কিন্তু পাসের হারের ক্ষেত্রে প্রতি বছরই দেখা যায়— তারা এগিয়ে রয়েছে, যা সঠিক চিত্র প্রদর্শন করে না। কারিগরি শিক্ষা এখনও শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারেনি অথচ পাবলিক পরীক্ষার ফলে তারা প্রতি বছরই এগিয়ে থাকে। বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নিশ্চয়ই দৃষ্টিতে এসেছে। তাই হয়তো বিষয়টি এবার একটি আলাদা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে জটিলতার পড়তে হয় ভর্তিছু মেধাবী শিক্ষার্থীদের। দেশের প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন শর্ত ও নিয়ম রয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদের বিপাকে পড়তে হয়। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই আলাদা আলাদা ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া তারিখ নির্ধারণে সমন্বয়হীনতা, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা গ্রহণ, প্রতিটি পরীক্ষার জন্য আলাদা ফি নির্ধারণ, একই ইউনিটে ভর্তিতে একাধিক শিফটে পরীক্ষা গ্রহণ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাসের বাইরে থেকে প্রশ্ন সংযোজন ইত্যাদি কারণে একজন শিক্ষার্থীকে এক ডজনরও বেশি আবেদন করতে হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের আর্থিক ক্ষতি ও মানসিক চাপে ভুগতে হয়। বিভিন্ন শিফটের পরীক্ষার মধ্যে প্রশ্নপত্রের মধ্যে সমন্বয় থাকে না। ফলে কোনো শিফটের পরীক্ষা সহজ, কোনোটি কঠিন,



মা ছুম বিল্লাহ

// যশোর বোর্ডের চমক ও //

উচ্চ মাধ্যমিকের ফল

জানুক আর নাই জানুক, ইংরেজি লিখতে, বলতে, শুনতে, বুঝতে পারুক আর নাই, পারুক— পাস করতে, ও জিপিএ-৫ পেতে কোনো বাধা নেই। এদিকটায় আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দেয়া একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু কবে দেব?

এবার উল্লেখ করার মতো পজিটিভ কয়েকটি বিষয় ঘটেছে। ২০১৫ সালে ১২টি বিষয়ে ২৩টি পত্রে সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা হয়েছিল। এবার ১৯টি বিষয়ে ৩৬টি পত্রে পরীক্ষা হয়েছে। সৃজনশীল প্রশ্নের আওতা বাড়ায় নম্বর বেশি উঠেছে এবং শিক্ষার্থীদের ভীতি কেটেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে। ৮৪৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে, গতবার এ সংখ্যা ছিল ১৩০। ২৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে একজন শিক্ষার্থীও পাস করতে পারেনি, যে সংখ্যা গতবার ছিল ৩৫। গত বছরের তুলনায় এবার পাসের হার ৫.১০ শতাংশ বেশি আর জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ১৫ হাজার ৩৮২। মোট জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবার ৫৮ হাজার ২৭৬। তাছাড়া প্রথমবারের মতো এবার বাংলা ও ইংরেজিতে দুই পত্র করে চারপত্র পরীক্ষা দিয়েছে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। ১৯৮৬ সালে আলিম স্তর এইচএসসির মান, অর্জনের পর থেকে ইংরেজি ও বাংলায় এক পেপার করে পরীক্ষা দিতে হতো মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের। ফলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো বিষয়ে ভর্তি থেকে বঞ্চিত ছিল। এ বৈষম্য দূর করতে এবার তাদের পরীক্ষা চার পেপারে নেয়া হয়েছে। এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় দিক। সবকিছুর ওপরে যে কথাটি বলতে হয়, তা হল— প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা এবার শোনা যায়নি। গত বছর পরীক্ষার আগের দিন রাতে সাজেশন আকারে এবং পরীক্ষার দিন সকালেও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বাইরে বের করে দেয়ার অভিযোগ ছিল। শিক্ষামন্ত্রীর যথাযথ পদক্ষেপের ফলে বিষয়টির অনেক উন্নতি হয়েছে।

গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর পর শিক্ষার্থীরা মোট নম্বর জানতে পারত না। এবার জিপিএ'র পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক নম্বর দেয়া হবে। তারা অনলাইনে সৃজনশীল, নৈর্ব্যক্তিক এবং ব্যবহারিকের নম্বর আলাদাভাবে জানতে পারবে। এটিও একটি উল্লেখযোগ্য দিক। কারণ একজন শিক্ষার্থী সব বিষয়ে ৮০ থেকে ৮১ কিংবা ৮২ নম্বর পেয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে। অন্য একজন শিক্ষার্থী পেয়েছে ৯৫ থেকে ৯৮ শতাংশ নম্বর। গ্রেডিংয়ে এ দুজন শিক্ষার্থীকে একই মানদণ্ডে মাপা হয়, যা কোনোভাবেই ঠিক নয়। একজন শিক্ষার্থী তত্ত্বীয় পরীক্ষায় ৭৫-এর মধ্যে পেয়েছে ২৪ আর ব্যবহারিক পরীক্ষায় পেয়েছে ২৫-এর মধ্যে ২৪। এ বিষয়টিও প্রদর্শিত হবে। তাই বিভিন্ন মহলের দাবি অনুযায়ী বোর্ড যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এতে গ্রেডিংয়ের ধোঁয়াশা কিছুট হলেও কাটবে।

ক্রমেই বাড়তে থাকা মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডের ফলাফল এবার

আবার কোনোটি পরিচিত, কোনোটি অপরিচিত বিষয় থেকে প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয়। এ বিষয়গুলো আমরা যখন আশির দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই, তখনও ছিল। এ নিয়ে অনেক কথাবার্তা ও আলোচনা হয়েছে; কিন্তু সমাধান হয়নি। জামির ইকবাল স্যার জাতীয় পর্যায়ে দু-একবার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন বিষয়টি সমাধানের জন্য; কিন্তু খুব একটা সাড়া পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে শিক্ষার্থীদের এবারও বিপাকে পড়তে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি বিষয়গুলোর একটি সহজ সমাধান বের করতে পারে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভোগান্তির কথা চিন্তা করে। ইউজিসি বলছে, দুটি নির্মাণাধীন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৯, তবে এখনও ৩৭টিই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া এখানে প্রথম বর্ষে আসন সংখ্যা ৪০ হাজার ৭২৭। ফলে স্পষ্টতই ৫৮ হাজার ২৭৬ জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ১৭ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না। এখানে সব জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরাই যে ভর্তি হবে তা তো নয়, শুধু 'এ' পাওয়া শিক্ষার্থীরাও তো ভর্তি হবে। তার মানে জিপিএ-৫ পেয়েও ভর্তির টেনশন কাটল না।

কৃতকার্য ও অকৃতকার্য সব শিক্ষার্থীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। যারা জিপিএ-৫ পাওনি, এমনকি যারা অকৃতকার্য হয়েছে, তাদের বলছি— চিন্তার কিছু নেই, দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। আপাতত হয়তো একটু খারাপ লাগবে, তাতে একেবারে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। তোমরা নিশ্চয়ই জনপ্রিয় কথাসিঁরা আনিসুল হকের লেখাটি পড়েছ। তিনি যথার্থই বলেছেন, তুমি যদি মেডিকেল কলেজে চাপ না পাও, তাহলে তুমি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মালিক হবে, তুমি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পারো, তাহলে তুমি বিরাট বিরাট শিল্প-কারখানার মালিক হবে, যেখানে অনেক ইঞ্জিনিয়ার তুমি নিজেই নিয়োগ দেবে। তুমি যদি পরীক্ষায় ফেল করো, তাহলে মন্ত্রী হবে; আর যদি ভালোভাবে পাস করো, তাহলে চিচার হবে— যা মেধাবী শিক্ষার্থীদের অনেকেই চায় না। তোমরা যারা সাইফুর রহমানের উপন্যাস 'শুধু একটি প্লটের জন্য' পড়েছ, তারা নিশ্চয়ই দেখেছে— যে শিক্ষার্থী ক্লাসে ভালো ছিল, সে হয়েছে গ্রামের এক কলেজের শিক্ষক। আর যে শিক্ষার্থী সবচেয়ে পেছনের সারিতে ছিল, সে হয়েছে মন্ত্রী। কাজেই তোমাদের ভয় নেই। মেধা আলাদা জিনিস। মেধার যাচাই সব সময় পাবলিক পরীক্ষার ফল দিয়ে হয় না।

মাছুম বিল্লাহ : ব্র্যাক শিক্ষাকর্মীসৃষ্টিতে কর্মরত, সাবেক ক্যাডেট কলেজ শিক্ষক

masumbillah65@gmail.com